# বিরল মৌলিকতার সাহস ও সামর্থ্য

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর *বিষাদগাথা* উপন্যাসটি, গল্প-উপন্যাস নিয়ে আমাদের অভ্যাসের ও অভ্যাস থেকে তৈরি ধারণার, একেবারে বাইরে। উপন্যাস-সিনেমার মতো শিল্প-আকারের পাঠক-দর্শক মিশ্র প্রকৃতির ও সংখ্যায় বেশি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর এই প্রথম উপন্যাস চর্চিত সচেতনতায় গড়ে তুলেছেন, তেমন সচেতনতা বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিরল। তাঁর সেই সচেতনতার প্রধান লক্ষণ— প্রায় পৌনে তিনশো পাতার উপন্যাসটি পড়ে কোনও পাঠকের পক্ষে বলা সম্ভবই নয়— উপন্যাসের গল্পটি কী, মানে, প্রধান গল্পটি কী, সেই গল্পের প্রধান চরিত্রের পরিচয় কী? এমন অনেক ধরনের মানুষ নিয়ে উপন্যাস খুব একটা দুর্লভ নয় কিন্তু সে মানুষগুলির কাজকর্ম, চলাফেরা ও নানা সম্বন্ধের মধ্যে একটা সংযোগ তৈরি করা ও সে-সংযোগটুকুকে সজীব রাখাই লেখকের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অমরেন্দ্র এই উপন্যাসের মানুষজন গুনে শেষ করা যাবে না। দু-চার লাইনের মধ্যেই তার আসা-যাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এমন মানুষটিরও একটি নাম আছে। একটি মানুষও এ উপন্যাসে নামহারা নয়। উপন্যাসটির কাহিনির ঘটনাস্থল যদিও খুব বেশি নয় কিন্তু সেই জায়গাগুলিরও নাম আছে, সেই প্রতিটি জায়গা কোনও না কোনও ঘটনায় চিহ্নিত। যে-কোনও পাঠক ইচ্ছে করলেই একটা ম্যাপ এঁকে ফেলতে পারেন।

এই স্থানকেন্দ্রিকতার বাইরে উপন্যাসটি এক পা-ও বাড়ায়নি। বহু দূরদূরান্তর থেকে, দেশদেশান্তর ও সাগরসাগরান্তর থেকে এই উপন্যাসে অনেকে এসে ভিড়েছে। এসে মারাও গিয়েছে আবার এই উপন্যাসের ভিতরে ঢুকে অনেকে, বিশেষ করে প্রাক্তন জমিদার চৌধুরীদের বাড়ির অনেকেই উপন্যাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, স্বেচ্ছায়— দূরদূরান্তর, দেশদেশান্তর ও সাগরসাগরান্তরে। আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছে বালিসোনায়, স্বেচ্ছায়, যেন বালিসোনায় ফিরে আসাতেই ছিল সেই সব দীর্ঘ প্রবাসের পথ।

দেবেশ রায়

# লেখকরাই নিজেদের বিশ্বাস করছেন না?

আড়ালে একটা গান তোলা হচ্ছিল। আমার কানে পৌঁছচ্ছিল সেই তোলার প্রয়াসটুকু। একটা খুব চেনা চরণ বারবার, বারবার গাওয়া হচ্ছিল, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি'। যে তুলছিল সে নিখুঁত স্বরলিপিকে নিজের কণ্ঠের নিজস্ব উচ্চারণে আনতে চাইছিল— 'দাঁড়িয়ে আছ। তুমি? এ কী!' স্বরলিপির তালের ও পর্বের বাধ্যতা সত্ত্বেও বাচ্যের মধ্যে যে-অপ্রস্তুত বিস্ময় নিহিত আছে, তাকে কণ্ঠে আনতে চাইছিল। কঠিন, খুব কঠিন কাজ। কিন্তু কেউ যদি সেই অপ্রস্তুত বিস্ময় বোধ করে থাকে আর তার গলায় যদি সে সামর্থ্য থাকে, তা হলে সে পেরে যায়, পৌঁছতে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস, 'জিপসি রাত' পড়ে আমার সেই আড়াল থেকে গান-তোলা শোনার অভিজ্ঞতা ঘটল। একটা বই, কী নিশ্চিতভাবে সব যুক্তি, সম্ভাব্যতা, ধারাবাহিকতা, ঘটনাক্রমের অভ্যস্ত ধারণাকে অবান্তর করে দেয় আর সেগুলোর অবান্তরতার ভিতর থেকে উপন্যাসের যে-উচ্চারণে পৌঁছতে চাইছিলেন ঔপন্যাসিক সেই উচ্চারণই পৌঁছে যায় পাঠকের কানে, যে সব সময়ই আড়াল থেকে শোনে, আর শোনে তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী, পাঠক তো সত্যি জানে না— ঝড় জয়ধ্বজা হতে পারে, ঘরভরা শূন্যতারও বক্ষস্পন্দন থাকে।

এ-উপন্যাসের বিস্তার মস্কোর মে-ডে সমাবেশে গর্বাচভের ভাষণ থেকে রোমানিয়া থেকে কলকাতা থেকে কাশী থেকে পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবন থেকে কলকাতার পুরনো বালিগঞ্জ থেকে বড়-বড় হোটেল, ভাড়াটে বাড়ি, প্রোমোটারি— কী না। অমরেন্দ্র দক্ষ ও সমর্থ নির্বিকারে এই বিপুলায়তন বিস্তারের কোনও কার্যকারণের শৃঙ্খলা তৈরিতে সময় ব্যয় করেননি। কিন্তু তাঁর নিশ্চিতজ্ঞানে, তিনি জানেন আমাদের আধুনিক জীবনে এমন চলৎবিস্তার আজ যে-কারোরই ঘটে যেতে পারে।

এটা জানতে পারা ঔপন্যাসিকের প্রাথমিক অনুভব যা শক্তিতে বদলে যায়। অথচ, ঘটনার একটা কার্যকারণ তিনি ঠিকই দিয়ে যান, যার অভাবে তাঁর উপন্যাসের বাস্তব, খাপছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমন দৃঢ়নিবদ্ধ মাত্র ২১৩ পৃষ্ঠার, আনুমানিক মাত্র ৬৪,০০০ শব্দের ও ১৮টি অসমান পরিচ্ছেদের উপন্যাসের বাস্তব যদি একবার খাপছাড়া হয়ে যায়, তবে তার আর কোনও মেরামতি সম্ভব নয়। দু-চার জায়গায় আমি তো ঠেকেও গেছি।

এ উপন্যাসটির ধারকচরিত্র সুধীন যে এক ঘূর্ণিপাকের মতো সময়ের ভিতর ঢুকে পড়েছে আকস্মিক, উপন্যাসটির আকার সেই ঘূর্ণাবর্তকেই গঠন দিয়েছে। উপন্যাসে এমনটি ঘটে না। আমরা বেশিরভাগ সময়ই আকারের বাধ্যতায় আটকে যাই— উপন্যাসের বড় আকারের মধ্যে যে অসংখ্য ছোট-ছোট আকার গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়, ও তেমন গড়ে ওঠা ও ভেঙে যাওয়াটাই উপন্যাস, সে-বিষয়ে উপন্যাসের লেখক ও পাঠক কেউই সব সময় খুব একটা খেয়াল রাখেন না। ফলে, অনেক লেখকই, বা ভালো পাঠকও, উপন্যাসের শুরু থেকে গল্পের যে-আকারটার ভিতর ঢুকে যান, তা থেকে প্রয়োজনেও বেরতে পারেন না। ভুলে যান, উপন্যাস, বাধ্যত কোনও একটি কাহিনির আধার নয়।

অমরেন্দ্র-র এ-উপন্যাসটিতে লোকজনের পরস্পরের প্রয়োজনীয় দেখাসাক্ষাৎও ঘটে যায় আচমকা, দরজা খুলে বা দরজা ঠেলে। তারপর তারা যে বাড়িতে বা ঘরে কে কোথায় আছে, তা একেবারেই প্রয়োজনীয় নয়। কেউ কোথাও যাওয়ার জন্য বেরোয় না। না খেয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না, না ঘুমিয়েও পারে না— সে-সব একরকম করে হয়ে যায়। খাওয়া ও শোয়ার অনেক বিবরণ আছে। দরজা খোলারও নানা কৌশল। বাড়িতে অনেক ভাড়াটে থাকেন। তাঁরা দু-একবার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেখা দিয়ে, তাঁদের কাজটুকু করে বা কথাটুকু বলেই হারিয়ে যান। এমন-কি, মৃত্যুমুখী এক পাঞ্জাবি সম্ভাব্য মৃত্যুর মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন ও সুধীনের দরকারি কাজ ঠেকিয়ে দেন।

লোকজনের এমন অনবরত আসা-যাওয়ার ফলে ও ট্রেনে-ট্রামে-বাসে-প্লেনে— নানা ধরনের নৌকোয়-রিকশায়-অটোতে-ট্যাক্সিতে যাতায়াতে উপন্যাসটির জায়গাগুলো একটা গতিবিস্তার পেতে থাকে— স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বা জাহাজঘাটার মতো— এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের মতো নয় বা হাল আমলের বড় রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মতো 'সচ্ছ' নয়— তার বিপরীতে প্রাণবান ও গতিবান। বারাণসী বা ক্যানিংয়ের বিখ্যাত বা অখ্যাত বেশ্যাপল্লির অলিগলিও কিন্তু চলমান, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের তাপ ছড়াচ্ছে। কোথাও কোনও অজানা বা জানা রহস্য থাকে না। পুরো গল্পটার অসম্ভাব্যতাকে এমন স্বাভাবিক ও সহজ করে তুলতে ঔপন্যাসিককে অনেক অনেক পরিস্থিতি লাফিয়ে পার হতে হয়েছে, পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলতাম, অনেক ঘটনা 'এলিমিনেট' বা মুছে ফেলতে হয়েছে। অমরেন্দ্রর উপন্যাসটি এমন মুছে-ফেলার কারুকার্যে ঠাসা। যা বলাই হয়নি তারও কিছু মুছে ফেলার দাগ আছে।

১১ পরিচ্ছেদ থেকে যমুনার যে-সন্ধান সুধীনের শুরু হয়, তার জীবনপণ লড়াই, সুন্দরবনের নিভৃত পল্লিতে ও আবাদে ও নদীপথে ও আলপথে, নতুন সব সম্পর্ক গড়ে ওঠা ও ভেঙে না-যাওয়ার নিয়তি যে ভবিতব্য হয়ে ওঠে, আবার পশ্চিম সুন্দরবনে সেই সন্ধানই যে আধাশহুরে সত্য হয়ে ওঠে, তাতে সুধীনের বাবার ডায়েরি ভুলে যেতে হয়। লেখকের কল্পনার ও লেখনের জাদুতেই এটা ঘটেছে। পড়ার পর নিভৃত ভাবনায় মনে হয়, বাবার ওই ডায়েরি না পড়লেও সুধীনের যমুনাসন্ধান এমনই মহৎ এক সন্ধান হতে পারত। হয়তো মহত্তরই হত।

উপন্যাসের শেষে আমরা একটা স্বস্তিতে পৌঁছই। মানবিক স্বস্তিতে। সেই স্বস্তিবোধ থেকেই রূপকথার মতো একটা পাঠ তৈরি হয়ে ওঠে। উপন্যাসের রূপকথা হয়ে ওঠা নিশ্চয়ই ভালো কথা নয়। কিন্তু উপন্যাস, উপন্যাস থেকেও যদি রূপকথাকে সত্য করে তোলে ও রূপকথা যদি উপন্যাসের মতোই যুক্তিকঠিন সত্য হয়ে ওঠে, তা হলে তো মানতেই হবে, অন্যরকম কিছু একটা ঘটছে উপন্যাসে।

দেবেশ রায়